রামপ্রিয় রামানুজ

প্রব্রাজিকা সত্যময়প্রাণা

শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র অঙ্কন করতে কবিগুরু তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় মহাকবির মুখে বলেছেন, ''কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম/ ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো।'' আমরাও শ্রীরামচন্দ্রের দ্বিতীয় সত্তা অনুজ লক্ষ্মণের চরিত্র চিত্রায়িত করতে কবির কথাকেই অনুসরণ করে বলতে পারি—কার চরিত্র ঘিরে সুন্দর কান্তি ধরেছে সুনির্মল ভ্রাতৃপ্রেম, কে এমন ক্ষাত্রতেজের জ্বলন্ত মূর্তি প্রিয়ানুজ লক্ষ্মণের মতো? আসলে কবি অনুভব করেছিলেন, ''পরিপূর্ণতার প্রতি ভারতবর্ষের প্রাণের একটা আকাঙ্ক্ষা আছে।'' সেই পরিপূর্ণতাই ভারতবর্ষ দেখতে চেয়েছে নিজের ভিতরে-বাইরে, চেতনে-অবচেতনে। তাই সে কখনও খণ্ডের কথা বলেনি, বলেছে অখণ্ডের কথা, ভাঙার কথা শোনায়নি, শুনিয়েছে গড়ার কথা। এই গড়ার, এই পরিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাই আমরা দেখি রামায়ণের পাতায় পাতায়। পরিপূর্ণ মানুষের আদর্শ রূপ, আদর্শ চরিত্র দেখিয়েই রামায়ণ ও মহর্ষি বাল্মিকী আমাদের হৃদয়ে একটি আসন নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। আমরা এই প্রবন্ধে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব বিষ্ণুর অর্ধাংশসম্ভূত মহাবীর, সর্বাস্ত্রকুশল, স্বর্ণকান্তি, পূর্ণচন্দ্র-নিভানন (বাল্মীকি রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ১৮।১৪, অরণ্যকাণ্ড, ৩১।১৬) ভ্রাতৃত্বের আদর্শ রূপ সেই লক্ষ্মণের প্রতি।

ভারতবর্ষের 'শিশু' মায়ের কাছে আবদার করে ''মা গো, আমায় দে-না কেন/ একটি ছোট ভাই—/ দুইজনেতে মিলে আমরা/ বনে চলে যাই।'' সেখানে বড় দাদা কিংবা সীতার জন্য আর্তি নেই, আছে ছোট একটি ভাই পাওয়ার ব্যাকুলতা। কারণ লক্ষ্মণ ভাইয়ের বীরত্ব ও ভালবাসার গল্প শুনেই ভারতের শিশু বড় হয়।

'রামায়ণী কথা'য় দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, ''ভ্রাতৃস্নেহে তিনি [লক্ষ্মণ] স্বীয়-অস্তিত্বশূন্য হইয়া গিয়াছিলেন। ভরতের, এমন-কি সীতারও, মৃদু অথচ তেজোব্যঞ্জক ব্যক্তিত্ব তাঁহাদের সুগভীর ভালবাসার মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, কিন্তু রামের প্রতি লক্ষ্মণের স্নেহ সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা। ভরত রামচন্দ্রের জন্য যে সকল কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রাণে আঘাত দেয়—তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে ঐরূপ আত্মত্যাগ

সন্ন্যাসিনী, শ্রীসারদা মঠ

আমাদের নিকট অপূর্ব পদার্থ বলিয়া বোধ হয়; ভরত স্বর্গের দেবতার ন্যায়, তাঁহার ক্রিয়াকলাপ ঠিক যেন পৃথিবীবাসীর নহে, উহা সর্বদাই ভাবের এক উচ্চগ্রামে আমাদের মনোযোগ সবলে আকর্ষণ করিয়া রাখে। কিন্তু লক্ষ্মণের আত্মত্যাগ এত সহজভাবে হইয়া আসিয়াছে, উহা বায়ু ও জলের মত এত সহজপ্রাপ্য যে, অনেকসময়ে ভরতের আত্মত্যাগের পার্শ্বে লক্ষ্মণের খনিত্রদ্বারা মৃত্তিকা-খনন প্রভৃতি সেবাবৃত্তির মধ্যে আমরা তাঁহার সুগভীর প্রেমের গুরুত্ব অনুভব করিতে ভুলিয়া যাই। অত্যন্ত সহজে প্রাপ্ত বলিয়া যেন উহা উপেক্ষা পাইয়া থাকে। তথাপি ইহা স্থির যে, লক্ষ্মণ ভিন্ন রামকে আমরা একেবারেই কল্পনা করিতে পারি না। তিনি রামের প্রাণ ও দেহের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছিলেন।" ভাইয়ের জন্য ভাইয়ের আত্মত্যাগের এই শক্ত ভিতের ওপরেই ভারতবর্ষ চির অম্লান।

বাল্যকাল থেকেই শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের নিত্যসহচর। তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে এমনভাবে অনুসরণ করতেন যে বাল্মীকি তাঁকে বর্ণনা করেছেন, ''লক্ষ্মণো লক্ষ্মিসম্পন্নো বহিঃপ্রাণ ইবাপরঃ" (আদিকাণ্ড, ১৮।৩০) বলে; ''রূপগুণ-সম্পন্ন লক্ষ্মণ যেন রামচন্দ্রের অপর প্রাণের মতো।" রামচন্দ্র ঘোড়ায় চড়ে মৃগয়ায় গেলে ধনুর্বাণ হাতে লক্ষ্মণ তাঁর পিছনে যেতেন। রাজা জনক দুইভাইকে প্রথম দেখে বিশ্বামিত্রের কাছে তাঁদের পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন। তাঁর চোখেও ধরা পড়েছিল ''পরস্পরস্য সদৃশৌ প্রমাণেঙ্গিত-চেষ্টিতৈঃ" (পূর্বোক্ত, ৫০।২১)—''আকারে ইঙ্গিতে কার্য সম্পাদনায় এঁরা একে ঠিক অপরের মতো।" শূর্পণখা দুভাইয়ের কাছে বিতাড়িত হয়ে রাবণের কাছে লক্ষ্মণের পরিচয় দিয়েছেন, ''রামস্য দক্ষিণো বাহুর্নিত্যং প্রাণো বহিশ্চরঃ" (অরণ্যকাণ্ড, ৩৪।১৪) —''তিনি রামের দক্ষিণ বাহু, রামের প্রাণই যেন তাঁর মাধ্যমে বাইরে বিচরণ করছে।"

আমাদের মনে পড়বে, অভিষেকের প্রস্তাবে রাজসভায় সকলে যখন উৎফুল্ল মনে শ্রীরামচন্দ্রের রূপগুণ বর্ণনা করতে লাগলেন, চারদিকে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল, রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে ডেকে সুসংবাদটি শোনালেন, মাতা কৌশল্যা মধুর বচনে পুত্রকে আশীর্বাদ করলেন, লক্ষ্মণ হাতজোড় করে নিঃশব্দে বসেছিলেন, তখন অগ্রজ অনুজকে বললেন, ''লক্ষ্মণ, আমার অন্তরের দ্বিতীয় আত্মারূপে তোমাকে আমি জানি", ''জীবিতং চাপি রাজ্যঞ্চ ত্বদর্থমভিকাময়ে" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৪।৪)— ''দীর্ঘ জীবন এবং রাজ্য তোমার জন্যই আমি কামনা করি।" দাদার স্মিতহাসিমাখা বড় কোমল স্বরে উচ্চারিত কথাগুলির মধ্যে কোথাও কোনও উচ্ছ্বাস চোখে পড়ে না। অনুভব করা যায়, ছোট্ট ভাইটির জন্য শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয়ের গভীরে লালিত স্নেহ। আমরা কল্পনায় দেখি অগ্রজের এই স্নিগ্ধ আদরবাক্যে নতনয়ন, সুন্দরকান্তি লক্ষ্মণভাইয়ের গালদুটি নীরব প্রফুল্লতায় যেন লাল হয়ে উঠল।

অযোধ্যায় আনন্দবান। বাড়ির দেউড়িতে ছেলেরা দলে দলে আনন্দে খেলা করছে। তাদের মুখেও রামের অভিষেকের কথা (পূর্বোক্ত, ৬।১৬)। অভিষেক-সংবাদে রাজা দশরথ, রানি কৌশল্যা প্রমুখ সকলের সম্বন্ধে রানি কৈকেয়ীর কাছে দাসী মন্থরা নেতিবাচক কথা বললেও লক্ষ্মণ সম্বন্ধে বলেছেন, ''সুমিত্রনন্দন লক্ষ্মণ রামকে রক্ষা করবে। ...অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মতো তাদের গভীর ভ্রাতৃপ্রেম জগতে প্রসিদ্ধ।" (পূর্বোক্ত, ৮।৩১) শৈশবেই তাঁদের পরস্পরের প্রতি আনুগত্য ও গভীর প্রীতি দাসদাসীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

লক্ষ্মণের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাঁর ক্ষাত্রবীরোচিত পৌরুষ। মন্থরার প্ররোচনায় কৈকেয়ীর কথায় রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে বনবাসের আদেশ দিলে লক্ষ্মণ কিছুতেই তা মেনে নিতে পারেননি। ধর্মরক্ষক নরশ্রেষ্ঠ অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্র

তাঁকে পরম মমতায় বুঝিয়েছেন, ''এসবই দৈবের ফলে ঘটেছে। যা চিন্তার অতীত এবং কোনও প্রাণীর দ্বারাই যার প্রতিবিধান করা যায় না, তা-ই হল দৈব। এইজন্যই আমার এবং তাঁর [সীতার] উপর এই দুর্ভাগ্য নেমে এল। লক্ষ্মণ, কোন মানুষ দৈবের সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারে? কর্মফলভোগের আগে তার কোনও কারণ যে দেখা যায় না। সুখে-দুঃখে, ভয়ে, ক্রোধে, লাভে-ক্ষতিতে, উৎপত্তি এবং বিনাশে যা কিছু অদ্ভুত তথা অজ্ঞেয় ব্যাপার ঘটে, তা সবই দৈবেরই কর্ম।... যে-কাজ শুরু হয়ে গেছে, তা ত্যাগ করে, যা ভাবা হয়নি, হঠাৎ সে-কাজ আরম্ভ করা, নিশ্চয়ই দৈবের ফল। এই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা আমি নিজেকে সংযত করেছি। তাই ভাই তুমিও অনুতাপ ত্যাগ করে আমার অনুসরণ করো।" (পূর্বোক্ত, ২২।২০-২৫) অগ্রজের এই আদেশে লক্ষ্মণ নতমস্তকে কিছুক্ষণ চিন্তা করে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেও পরক্ষণেই স্বভাবোচিত পৌরুষে অতি ক্রুদ্ধ হয়ে ভ্রূকুটি করতে করতে দাদার প্রতি বাক্যবাণ নিক্ষেপ করতে শুরু করলেন। মহর্ষি বাল্মীকি এ-হেন লক্ষ্মণকে তুলনা করেছেন ক্রুদ্ধ সিংহের সঙ্গে (পূর্বোক্ত, ২৩।৩)। হস্তী যেমন তার শুঁড়কে নানাদিকে সঞ্চালিত করে তেমনই লক্ষ্মণ তাঁর ডানহাতটিকে নানাদিকে ঘুরিয়ে রামকে উদ্দেশ করে বললেন, ''বীর ক্ষত্রিয়প্রধান হয়েও, আপনি দুর্বলের মতো এইরকম কথা বলছেন। কেনই বা কদর্য দুর্বল দৈবের আপনি প্রশংসা করছেন?... যে-বুদ্ধিতে আপনার এই দ্বিধাভাব এসেছে, যাতে আপনি আজ মোহগ্রস্ত হয়েছেন আমি সেই ধর্মকে দ্বেষ করি।... যে বীর্যহীন, ক্লীব সেই দৈবকে অনুসরণ করে। যারা বীর এবং আত্মসম্মানজ্ঞান-সম্পন্ন তারা কখনও দৈবকে উপাসনা করে না।... আজ পুরুষের পৌরুষ এবং দৈবের ক্ষমতা সবাই দেখবে। দৈব এবং মানুষের শক্তিপ্রকাশ এবং বিলয় আজ পরীক্ষিত হবে।... মদোদ্ধত হস্তীর মতো দুর্বার যে-দৈব, তাকে আমি পৌরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করব।" (পূর্বোক্ত, ২৩।৬,১১,১৬,১৮,১৯,২০) এই বীর্য, এই পৌরুষ আমাদের মুগ্ধ করে। মনে পড়ে যায় এযুগের পৌরুষের প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দের একটি ঘোষণা—ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছিলেন, ''যতই বয়স বাড়ছে ততই দেখছি—সবকিছু আছে পৌরুষের মধ্যে। এই আমার নতুন বার্তা।"[১]

এরপর নানাভাবে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে অভিষেক কার্য সম্পন্ন করতে অনুরোধ করেও যখন দেখলেন অগ্রজ পিতৃআজ্ঞা পালনে বদ্ধপরিকর, তখন তীব্র আবেগে বলতে লাগলেন, ''আমি একাই বিরোধী রাজগণকে প্রতিরোধ করতে সমর্থ। আমার এই বাহুদুটি শোভাবৃদ্ধির জন্য নয়, এই ধনু আমি অলঙ্কাররূপে ধারণ করিনি, এই তরবারি খাপে বেঁধে রাখার জন্য নয় আর তীরগুলিও শুধু তূণে স্থান পাবে না। আমার এই চারটিই শত্রুবিনাশের জন্যই।" (পূর্বোক্ত, ২৩।৩০) বলতে বলতে ক্ষোভে, দুঃখে ও ক্রোধে লক্ষ্মণের দুইচক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। এই ভাষণে যে-উগ্র পৌরুষ প্রকাশিত হয়েছে তা অবশ্যই ক্ষত্রিয়ের উজ্জ্বল ভূষণ। দীনেশচন্দ্র সেন বনবাসাজ্ঞাপ্রাপ্ত রামচন্দ্রের চরম নির্লিপ্তি এবং অভিমানাহত অনুজ লক্ষ্মণের এই ছবিটি বড় সুন্দর করে এঁকেছেন গুটিকয়েক বাক্যে :

''যেদিন কৈকেয়ী অভিষেক-ব্রতোজ্জ্বল প্রফুল্ল রামচন্দ্রকে মৃত্যুতুল্য বনবাসাজ্ঞা শুনাইলেন, রামের মূর্তি সহসা বৈরাগ্যের শ্রীতে ভূষিত হইয়া উঠিল। তিনি ঋষিবৎ নির্লিপ্তভাবে গুরুতর বনবাসাজ্ঞা মাথায় তুলিয়া লইলেন, অভিষেক-সম্ভারের সমস্ত আয়োজন যেন তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। সেই দিন সেই উৎকট মুহূর্তেও তাঁহার আর কোন সঙ্গী ছিল না, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে চিরসুহৃৎ ভক্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বাল্মীকি দুইটি ছত্রে সেই মৌন চিত্রটি আঁকিয়াছেন—

'তং বাষ্পপরিপূর্ণাক্ষঃ পৃষ্ঠতোঽনুজগাম হ।
লক্ষ্মণঃ পরমক্রুদ্ধঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ॥'

—লক্ষ্মণ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বাষ্পপূর্ণচক্ষে ভ্রাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন।" (পূর্বোক্ত, ১৯।৩০)

বনবাস গমনোদ্যত শ্রীরামচন্দ্রকে শরতের চাঁদের সঙ্গে তুলনা করে বাল্মীকি লিখেছেন, ''শরতের চন্দ্র যেমন নিজের স্বাভাবিক তেজ ত্যাগ করে না, তেমনই আত্মনিষ্ঠ বীর রামচন্দ্র নিজের আনন্দ ত্যাগ করলেন না।" একই সঙ্গে এঁকেছেন লক্ষ্মণেরও ছবি : ''রামের গুণরাজির দ্বারা রামের সমতুল বিপুল বিক্রমী ভাই লক্ষ্মণ অন্তরে দুঃখকে ধারণ করে তাঁর অনুগমন করলেন।" (পূর্বোক্ত, ১৯।৩৯)

রামের বনবাসের জন্য কাউকেই লক্ষ্মণ ক্ষমা করতে পারেননি। কৌশল্যার সঙ্গে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা করেছেন, সমস্ত অযোধ্যাপুরী নষ্ট করে দিতে চেয়েছেন। রামের কর্তব্যবুদ্ধিরও প্রশংসা করেননি। এসব সত্ত্বেও যখন দেখেছেন রামচন্দ্র পিতৃআদেশ পালনে সুমেরুবৎ অটল—তখন কোথা থেকে এক অপূর্ব কোমলতা তাঁকে অধিকার করে বসল। দাদাকে ছেড়ে থাকতে না পারার বেদনা তাঁকে বিহ্বল করে তুলল। ছোট্ট ভাইটি সেদিন দাদার পা দুটি দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, ''আমি দেবলোকে যেতে, দেবত্ব এমনকী ত্রিলোকের ঐশ্বর্যও আপনাকে ছেড়ে চাই না।" (পূর্বোক্ত, ৩১।৫) মানসলোকে ভ্রাতৃপ্রেমের এমন দৃশ্য আস্বাদন করতে করতে চোখদুটি আপনিই আর্দ্র হয়, মন বলে ওঠে সাধু সাধু। কবিগুরুর কথার সত্যতাও হৃদয়ঙ্গম হয়—''ভ্রাতায় ভ্রাতায়... ধর্মের বন্ধন... প্রীতিভক্তির সম্বন্ধ... কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছে।"

প্রাণসম ভাইয়ের এই অনুনয় সত্ত্বেও শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে স্নেহমধুর সম্ভাষণে নিবৃত্ত করতে সচেষ্ট হলে ক্ষাত্রবীর লক্ষ্মণও কোমলতা ত্যাগ করে দু-একটি দৃঢ়বাক্যে অগ্রজের কাছে জানতে চান, ''আপনি শৈশব থেকেই আমার কাছে প্রতিশ্রুত, আমি আপনার আজন্ম সহচর, আজ তার ব্যতিক্রম করতে চাইছেন কেন?" (আদিকাণ্ড, ৩১।৭) পরক্ষণেই নিজে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, ''গুণসমেত ধনু, কোদাল এবং ঝুড়ি নিয়ে পথ দেখিয়ে আমি আপনার আগে আগে যাব। আপনার জন্য প্রতিদিন তপস্বীদের যোগ্য আহার্য এবং ফলমূল সংগ্রহ করব।... আপনারা ঘুমিয়েই থাকুন অথবা জেগে, আমিই সব করব।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ৩১।২৫-২৬) আবারও মনে পড়ে কবিগুরুর 'শিশু'র সেই অপূর্ব অকুতোভয়তার কথা—''কিন্তু আমি পারি যেতে,/ ভয় করিনে তাতে—/ লক্ষ্মণভাই যদি আমার/ থাকত সাথে সাথে।"

আর একটি দিক আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। তা হল লক্ষ্মণের প্রতি সকলের অনাদর। মহর্ষি সচেতন ভাবেই লক্ষ্মণকে একটু অনাদৃত করে এঁকেছেন বলে মনে হয়। স্মরণে আসে, যেদিন বিশ্বামিত্র যজ্ঞরক্ষায় রাক্ষসবধের জন্য রামচন্দ্রকে নিয়ে যেতে দশরথের কাছে প্রার্থনা জানান, সেদিন দশরথ ভীত হয়ে বলেছিলেন, ''ঊনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ।" (আদিকাণ্ড, ২০।২)—''আমার পদ্মচক্ষু রামের বয়স মাত্র পনেরো।" অথচ আর একজন 'রাজীবলোচন'ও যে অগ্রজের সঙ্গে চললেন তাতে পিতার আক্ষেপ বা ভীতি কোনও ছবিই মহাকবি আঁকেননি। এমনকী কবিগুরু তাঁর 'কাব্যের উপেক্ষিতা'য় লক্ষ্মণপত্নী ঊর্মিলার উপেক্ষার কথা বলতে গিয়ে অশেষ প্রকারে প্রাণের বেদনা ব্যক্ত করেছেন। ঊর্মিলার দুঃখে যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে কবিমন। লক্ষ্মণপত্নীর প্রতি মহাকবির এই অনাদরে কবিগুরু জানতে চেয়েছেন, ''কবি-কমণ্ডলু হইতে একবিন্দু অভিষেকবারিও কেন তাহার চিরদুঃখাভিতপ্ত ললাটে সিঞ্চিত হইল না।" কিন্তু ঊর্মিলাপতির অনাদরের ছবি কি কবিগুরুর

দৃষ্টিতে একেবারেই ধরা দেয়নি? অথবা ইচ্ছাকৃতভাবেই কি কবিও তা বাল্মীকির মতোই এড়িয়ে গেছেন?

আমরা দেখি অযোধ্যার যত অশ্রু সবই রামসীতার জন্য বর্ষিত হয়েছে। সীতার পাদপদ্মের অলক্তরাগ মুছে যাবে, তা কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হবে। রমণী স্বভাবতই কোমলা। তাই এ-অশ্রুর কারণ তবু বোধগম্য হয়। কিন্তু রাজপ্রাসাদে লালিত রামচন্দ্র কোথায় কোন গাছতলা খুঁজে ধুলোয় শয়ন করবেন, এমন নানা আক্ষেপোক্তি করতে করতে দশরথ, কৌশল্যা সহ গোটা অযোধ্যাবাসীর চোখের জলের ধারা ধুলো ভিজিয়ে দিয়েছে। প্রশ্ন জাগে, শুধু রামচন্দ্রই কি রাজসুখে প্রতিপালিত, লক্ষ্মণ কি রাজপুত্র নন? তিনি কি বনেবাদাড়ে বড় হয়েছেন? প্রজারা রথের চাকা ধরে সারথি সুমন্ত্রকে বলতে লাগলেন (অযোধ্যাকাণ্ড, ৪০।২২)—

''সংযচ্ছ বাজিনাং রশ্মীন্ সূত যাহি শনৈঃ শনৈঃ।
মুখং দ্রক্ষ্যাম রামস্য দুর্দর্শং নো ভবিষ্যতি॥''

—''সারথি, অশ্বের রশ্মি সংযত করে ধীরে ধীরে চলো, আমরা রামের মুখখানি ভাল করে দেখে নিই।'' কিন্তু লক্ষ্মণের জন্য কাউকে বিলাপ করতে দেখা গেল না। ''অহো, লক্ষ্মণ, তুমি আজ কৃতার্থ। সর্বদা প্রিয়ভাষী দেবতার মতো দাদাকে তুমি সেবা করতে পারবে। তোমার এই সদ্‌বুদ্ধি মহৎ। এতে তোমার সুমহৎ কল্যাণ হবে তুমি যে এঁকে অনুগমন করছ, এটাই স্বর্গের পথ।'' (পূর্বোক্ত, ৪০।২৫) —ইত্যাদি বলে রামকেই সবাই আদর করতে লাগলেন। এই মমত্ববোধ শুধু রামসীতারই জন্য; বেচারি লক্ষ্মণভাইয়ের জন্য কারোরই নয়।

এমনকী লক্ষ্মণজননীও পুত্রের বিদায়কালে পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করে বললেন, ''তোমার দাদা বনে যাচ্ছে। বাছা, তাকে অনুসরণ না করে তুমি ভুল কোরো না।...যাও যাও। রামকে দশরথের মতো দেখো, সীতাকে আমার মতো মনে কোরো, এবং বনকে অযোধ্যা বলে গণ্য কোরো।'' (পূর্বোক্ত, ৪০।৮-৯) দীর্ঘ বিচ্ছেদ, জানাই আছে। অথচ পুত্র মায়ের একবিন্দু অশ্রুও দেখলেন না, বরং শুনলেন কর্তব্যবাক্য আর বারংবার 'গচ্ছ গচ্ছ' —'যাও যাও'। যাত্রাকালে লক্ষ্মণের সঙ্গে ঊর্মিলার কোনও কথা হয়েছে কী না মহর্ষি তা কোথাও বলেননি। তাঁদের পরস্পরের সাক্ষাতের কথা এই সময়ও কোথাও আমরা পাই না। এতখানি নীরবতা না দেখিয়েও কি লক্ষ্মণের সমুজ্জ্বল চরিত্রটি আঁকা যেত না? উত্তর পেতে আজ কার কাছে দাঁড়াই?

অবশ্য সকলের এই উদাসীনতায় লক্ষ্মণের প্রকৃত সত্তাটি দীনেশচন্দ্র সেনের লেখনীতে ধরা পড়েছে: ''মৌন সন্ন্যাসী আত্মীয় সুহৃদবর্গের উপেক্ষা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তিনি মনেও করেন নাই, রামচন্দ্রের জন্য যে শোকোচ্ছ্বাস, তাহার মধ্যেই তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি কাহারও নিকট বিলাপ প্রত্যাশা করেন নাই। রামপ্রেমে তাঁহার নিজের সত্তা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।'' বাস্তবিক, লক্ষ্মণের নিজের সত্তা অগ্রজের প্রেমে কতখানি লুপ্ত হয়েছিল, রামায়ণ পাঠে ক্ষণে-ক্ষণে তা অনুভূত হয়।

সুখলালিত রাজকুমারেরা কেউই অরণ্যজীবনে অভ্যস্ত নন। অথচ দেখি কী অবলীলায় লক্ষ্মণ দিনরাত পরিশ্রম করেছেন রামচন্দ্র ও জানকীকে সুখ ও স্বস্তি দিতে। অরণ্যজীবনের কঠোরতার প্রায় সবটাই সানন্দে মাথায় তুলে নিয়েছিলেন লক্ষ্মণ। পর্বতের পাদদেশে প্রস্ফুটিত বনকুসুম তুলে রামচন্দ্র যখন সীতা দেবীর চুলে বেঁধে দিতেন, বা ফুলের রেণু দিয়ে কপালে তিলক এঁকে দিতেন, অথবা পদ্ম তুলে মন্দাকিনীর স্বচ্ছ জলে অবগাহন করতেন, আবার কখনও গোদাবরীতীরে জনকদুহিতার কোলে মাথা রেখে সুখে নিদ্রা যেতেন, তখন লক্ষ্মণকে দেখা যেত মৌন সন্ন্যাসীর মতো হয়তো কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে পর্ণশালা নির্মাণ করছেন, বা কুঠার

দিয়ে শালগাছের শক্ত ডাল কাটছেন। আবার কখনও তিনি অস্ত্রশস্ত্র, জানকীর পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদির বড়সড় একটা পুঁটুলি কাঁধে নিয়ে একস্থান থেকে আর একস্থানে যাচ্ছেন। কখনও মহিষ বা বৃষের পুরীষ সংগ্রহ করে আগুন জ্বালিয়ে শিকার করে আনা হরিণ বা বন্যজন্তু ঝলসে খাদ্যের ব্যবস্থা করছেন। আবার কখনও দেখা যেত 'শীতকালের তুষারমলিন জ্যোৎস্নার শেষ রাত্রে' নদী থেকে কলসি ভরে জল তুলে রাখছেন। কোনওদিন চিত্রকূট পর্বতের পর্ণশালা থেকে সরসীতটে যাওয়ার পথটি চিহ্নিত করতে পথে পথে উচ্চ গাছের শাখায় শাখায় গেরুয়া কাপড়ের টুকরো বাঁধছেন। কখনও কোমল ঘাসপাতা দিয়ে রামচন্দ্রের শয্যা প্রস্তুত করে অপেক্ষা করছেন। আবার কখনও বড় বড় কাঠ সংগ্রহ করে শুকনো বন্য ও বেতসলতা দিয়ে বেঁধে মাঝখানে জামশাখা দিয়ে সীতা দেবীর জন্য 'সুখাসন' তৈরি করছেন। একদিন পঞ্চবটীর সুন্দর গাছগাছালি পূর্ণ স্নিগ্ধ মনোরম পরিবেশ দেখে রামচন্দ্র ভাইকে পর্ণশালা রচনার জন্য একটি স্থান খুঁজতে বললেন। প্রভুসেবায় আত্মহারা ভৃত্যসদৃশ ভাইটি অমনি বলে উঠলেন, ''আপনি নিজে আপনার পছন্দমতো স্থান নির্দেশ করে আমায় বলুন।'' অনুজের কথায় সন্তুষ্ট হয়ে মধুর হেসে শ্রীরামচন্দ্র সর্বগুণান্বিত একটি স্থান পছন্দ করলে নিরলস বীর লক্ষ্মণ সানন্দে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে মেঝে সমান করে অচিরেই আশ্রম নির্মাণ করে নদী থেকে পদ্ম এনে বাস্তুপুজো করে আরাধ্য দেবদেবীকে গৃহে প্রবেশের অনুরোধ জানালেন। (অরণ্যকাণ্ড, ১৫)

একদিন রাত্রিবাসের জন্য গভীর অরণ্যে একটি গাছতলায় চারদিকে কালো কালো সাপ পরিবৃত হয়ে তাঁরা শুয়ে আছেন। লক্ষ্মণ পাহারায়। পথশ্রমে ক্লান্ত সীতার মলিন মুখকান্তি দেখে শ্রীরামচন্দ্র ব্যথিত হৃদয়ে লক্ষ্মণকে আর এ-কষ্ট দিতে চাইলেন না, তাই অযোধ্যায় ফিরে যাওয়ার জন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। লক্ষ্মণ অগ্রজের প্রতি গভীর ভালবাসার কথা কখনই মুখে প্রকাশ করতেন না। আত্মহারা সেবাতেই তার পরিচয় দিতেন। সেদিন শ্রীরামচন্দ্রের এমন কাতরোক্তিতে দুঃখিত হয়ে লক্ষ্মণ জানালেন (পূর্বোক্ত, ৫৩।৩২),

''ন হি তাতং ন শত্রুঘ্নং ন সুমিত্রাং পরন্তপ।
দ্রষ্টুমিচ্ছেয়মদ্যাহং স্বর্গং চাপি ত্বয়া বিনা॥''

—''আজ আমি পিতা, সুমিত্রা, শত্রুঘ্ন এমনকী স্বর্গও আপনাকে ছেড়ে দেখতে ইচ্ছা করি না।''—এমন ভ্রাতৃপ্রেমের কথা শুধু একা রামই নন, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ভারতবাসীও শ্রদ্ধার সঙ্গে হৃদয়ে ধারণ করে রেখেছেন। অথচ এখানে একবারও ঊর্মিলার নাম তিনি উচ্চারণ করলেন না। এই অনুচ্চারণ লক্ষ্মণ-চরিত্রের সংযত মনেরই পরিচয় বহন করে।

এরপর স্বর্ণমৃগ মারীচকে ধরতে রামচন্দ্র ও সীতা দেবী উৎসুক হলে বিচক্ষণ লক্ষ্মণ প্রথমেই আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, এমন রত্নচিত্রিত মৃগ কোথাও নেই। এ যে মায়ামৃগ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। (পূর্বোক্ত, ৪৩।৫-৮) সেকথায় কান না দিয়ে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের ওপর সীতারক্ষার ভার দিয়ে হরিণ ধরতে ছুটলেন। পরে মারীচের মায়াবী আর্তস্বরে সীতা দেবী বিহ্বল হয়ে লক্ষ্মণের প্রতি কত যে অশোভন বাক্যবাণ বর্ষণ করেছেন তা পড়ে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। এখানেও আমরা লক্ষ্মণের মর্যাদাবোধ ও শালীনতা প্রদর্শনে তাঁর মধ্যে আত্মজ্ঞানী সাধূচিত ধীশক্তিরই ছবি জ্বলজ্বল করতে দেখি। জানকীর কঠিন ও অশালীন বাক্যবাণে জর্জরিত হয়েও ক্ষাত্রবীর্যের প্রতিভূ লক্ষ্মণ হাতজোড় করে সবিনয়ে জানিয়েছেন, ''আপনি আমার দেবতা। আমি আপনাকে এইসকল কথার উত্তর দিতে পারি না। আপনার কথাগুলি তপ্তবাণের মতো আমার কর্ণকে যেন দগ্ধ করছে।... আমি রামের কাছে যাচ্ছি। আপনার মঙ্গল হোক।... জানি

না অগ্রজের সঙ্গে ফিরে এসে আপনাকে দেখতে পাব কী না।" (পূর্বোক্ত, ৪৫।২৮-৩৪)

সেদিন জনকনন্দিনীর অসংযত বাক্যবাণে অসাধারণ জিতেন্দ্রিয় ভক্তিমান লক্ষ্মণের ধৈর্যচ্যুতির চিত্র অঙ্কন করে মহর্ষি লিখেছেন, ''কৃতাঞ্জলি বিশুদ্ধচিত্ত লক্ষ্মণ কিঞ্চিৎ নত হয়ে সীতাকে অভিবাদন করলেন। ও বারবার তাঁকে ফিরে ফিরে দেখতে দেখতে রামের কাছে গেলেন।" (পূর্বোক্ত, ৪৫।৪০) এই 'কিঞ্চিৎ' শব্দটি দিয়ে মহর্ষি বুঝিয়ে দিয়েছেন সীতার কুবাক্যে অত্যন্ত অসহায় বোধ করে চরিত্রবান লক্ষ্মণ ভাল করে প্রণামটুকু করে যেতে পারলেন না।

লক্ষ্মণের সংযত মনের আর এক স্থিরচিত্র আমরা দেখতে পাব। মারীচবধ করে ফিরে এসে জানকীকে দেখতে না পেয়ে রামচন্দ্র যখন বিলাপ করতে লাগলেন, তখন অবিচলিত লক্ষ্মণ এতটুকু ধৈর্য না হারিয়ে 'চিন্তাবিলাপরহিত' নির্লিপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষের মতো অগ্রজকে উপদেশ দিয়েছেন শোক পরিত্যাগ করে ধৈর্য অবলম্বন করতে। একদিন না একদিন প্রিয়জনের সঙ্গে অবশ্যই বিচ্ছেদ ঘটবে। সেই দুঃখ স্মরণ করে স্নেহ পরিত্যাগ করতে অনুরোধ করেছেন একাধিক বার। (পূর্বোক্ত, ৬১।১৪) আবার লোকাপবাদে যখন সীতাকে ত্যাগ করে শ্রীরামচন্দ্র মরমে মরে গেছেন, তখনও লক্ষ্মণ ব্যথিত হয়েও অগ্রজকে উপদেশ করেছেন, ''সংসারের সকল ঐশ্বর্যই কালে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।... সংযোগ অবশ্যই বিয়োগে পরিণত হয়... তাই স্ত্রী-পুত্র-মিত্র ও ধনে অত্যাসক্তি উচিত নয়।" (উত্তরকাণ্ড, ৫২। ১০-১২) তাঁর চরিত্রের এই সহজাত নির্লিপ্তি ও একইসঙ্গে মাতৃমমতা দিয়ে তিনি অগ্রজকে দৈহিক ও মানসিক সবদিক থেকে রক্ষা করে ক্ষাত্রতেজে উদ্বুদ্ধ করেছেন বারংবার।

আবার দেখি, কবন্ধ রাক্ষস তাঁদের আক্রমণ করলে লক্ষ্মণ তার কবলে পড়েও নিজের বিপদের কথা একবারও মনে না এনে কাতরভাবে রামচন্দ্রকেই বরং অনুনয় করেছেন, ''হে রাঘব, আমাকে এর বলিরূপে প্রদান করে আপনি পলায়ন করুন।" (অরণ্যকাণ্ড, ৬৯।৩৯)—মৃত্যুঞ্জয়, অসমসাহসী বীরের ভ্রাতৃপ্রেমের সঙ্গে চরম নিঃস্বার্থপরতার এই অপূর্ব প্রকাশ আমাদের অভিভূত করে।

লক্ষ্মণের অপর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্য। আকাশপথে সীতার নিক্ষিপ্ত অলঙ্কারগুলি বানররাজ সুগ্রীব রাম-লক্ষ্মণকে দেখালে রামচন্দ্র অধীর হয়ে পড়েন। লক্ষ্মণ কেবলমাত্র তাঁর নূপুরদুটিই চিনতে পারেন, হার বা কেয়ূর কোনওটাই নয় (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড,৬।২২)—কারণ জানকীর নিত্য পাদবন্দনাকালে শ্রীচরণ ছাড়া আর কোনও অবয়বই দেবর লক্ষ্মণ কোনওদিনই লক্ষ করেননি। দীনেশচন্দ্র সেন লক্ষ্মণের এই চরিত্রমাধুর্যকে তুলে ধরেছেন, ''লক্ষ্মণের পুরুষোচিত চরিত্র সর্বত্র সতেজ, তাঁহার পৌরুষদৃপ্ত মহিমা সর্বত্র অনাবিল—শুভ্র শেফালিকার ন্যায় সুনির্মল ও সুপবিত্র।"

শ্রীরামচন্দ্র প্রজানুরঞ্জনের জন্য সীতা দেবীকে বনবাসে পাঠালে অগ্রজের আদেশে অবনত মস্তকে নিরপরাধ জানকীকে আশ্রমে রেখে আসার সময় দুঃখে অভিমানে লক্ষ্মণের পৌরুষদৃপ্ত বুকটি যেন খান খান হয়ে যাচ্ছিল। কাঁদতে কাঁদতে জোড়হাতে সীতা দেবীর কাছে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি বলতে লাগলেন, ''বৈদেহী, আর্য রাম বুদ্ধিমান হয়েও আমাকে লোকনিন্দিত এই ক্রূর কাজে নিয়োগ করে লোকসমাজে নিন্দাভাজন করলেন। এইজন্য আমার হৃদয়ে দারুণ শল্য বিদ্ধ হচ্ছে। আজ আমার মৃত্যু হলে ভাল হত। হে শোভনে আমাকে ক্ষমা করুন।" (উত্তরকাণ্ড, ৪৭।৪-৬) সীতা যখন লক্ষ্মণের বিলাপের কারণ জানতে

পারলেন, তখন নিজেও বিলাপ করতে করতে লক্ষ্মণকে তাঁর সুস্পষ্ট গর্ভলক্ষণ দেখে যেতে অনুরোধ জানান। একথায় লক্ষ্মণ ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করে অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে বললেন, ''হে নিষ্পাপ পতিব্রতে, আমি পূর্বে কখনও আপনার রূপ দেখিনি, শুধু শ্রীচরণদুটিই দর্শন করেছি। শ্রীরামের অনুপস্থিতিতে বনমধ্যে একাকিনী আপনাকে আমি কী করে দেখব?'' (পূর্বোক্ত, ৪৮।২১) সাধুচরিত্র লক্ষ্মণের এই সম্ভ্রমবোধ, শিষ্টাচার, প্রকৃত পৌরুষ একাধিকবার দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। কিষ্কিন্ধ্যার রাজধানীতে সুগ্রীবকে খুঁজতে গিয়ে বাইরে থেকে নূপুর ও কাঞ্চীর শব্দ শুনে ''সৌমিত্রির্লজ্জিতোঽভবৎ'' (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড,৩৩।২৫) —এই লজ্জা চরিত্রবান সাধুমনেরই পরিচায়ক।

লোভরাহিত্য লক্ষ্মণের আর একটি চরিত্রভূষণ। রাম অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করে লক্ষ্মণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে চাইলে অগ্রজের একান্ত অনুগত হয়েও সে-অনুরোধ লক্ষ্মণ স্বীকার করেননি। কারণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভরতেরই যে এই সম্মান প্রাপ্য, তা তিনি ভুলে যাননি। দীনেশচন্দ্র সেন লক্ষ্মণভাইয়ের চরিত্রচিত্রণে শ্রদ্ধাভক্তি উজাড় করে বলেছেন, ''ক্ষাত্রতেজের এই জ্বলন্ত মূর্তি এই মৌন ভ্রাতৃভক্তির আদর্শ ভারতে চিরদিন পূজা পাইয়া আসিয়াছে। 'রাম-সীতা' এই কথা অপেক্ষাও বোধ হয় 'রাম-লক্ষ্মণ' এই কথা এতদ্দেশে বেশী পরিচিত। সৌভ্রাত্র্যের কথা মনে হইলে 'লক্ষ্মণ' অপেক্ষা প্রশংসার্হ উপমা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। ভরত ভ্রাতৃভক্তির পলান্ন—সুকোমল ভাবের সমৃদ্ধ উদাহরণ। কিন্তু লক্ষ্মণ ভ্রাতৃভক্তির অন্নব্যঞ্জন, জীবিকার সংস্থান।''

লক্ষ্মণের মতো রামচন্দ্রও ভাই-অন্তঃপ্রাণ। রাবণের শেলে নিজে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকলেও মৃতপ্রায় ভাইকে তিনি দুহাতে বুকে আগলে সজলনেত্রে কোমলস্বরে বলতে থাকেন, ''তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারব না। তুমি যেমন আমার সঙ্গে বনে গিয়েছিলে, আমিও তেমন তোমার সঙ্গে যমালয়ে যাব।... দেশে দেশে বন্ধু পাওয়া যায়, কিন্তু সহোদর ভাই মেলে এমন দেশ তো দেখি না। বীর লক্ষ্মণকে ছেড়ে রাজ্যে আমার কী হবে? হে বীর, বিষণ্ণ আমাকে সান্ত্বনা দেবে কে?... এখনই আমার মরণ ভাল'' ইত্যাদি। (যুদ্ধকাণ্ড, ১০১।১৫,১৬,১৮)

অগ্রজ এবং অনুজ কেউই কারও কাছে স্নেহের কোনও মূল্য চাননি। তাঁরা আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ। তাঁরা কেউই প্রত্যাশী নন, দুজনেই দাতা। অগ্রজ হয়তো একবার স্নেহালিঙ্গন করেছেন, অনুজের দুইচক্ষু তাতেই পুলকাশ্রুতে ঝকঝক করে উঠেছে। ভরত ছাড়া আমরা রামকে কল্পনা করতে পারি; এমনকী সীতা ছাড়াও রামকে কল্পনা করার সুবিধা করে দিয়েছেন কবিগুরু—''রাবণ আমার কী করবে মা,/ নেই তো আমার সীতা''—কিন্তু লক্ষ্মণ ভাই ছাড়া রামচরিত্র সত্যিই অসম্পূর্ণ। ✠

তথ্যসূত্র

১। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *নিবেদিতা লোকমাতা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৪, খণ্ড ২, পৃঃ ৫১

সহায়ক গ্রন্থ

১। *বাল্মীকিকৃত রামায়ণম্*, অনুবাদ, আলোচনা ও সম্পাদনা : ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, নিউলাইট, কলকাতা, ভাগ ১ (১৯৯৬), ভাগ ২ (১৯৯৭)

২। দীনেশচন্দ্র সেন, *রামায়ণী কথা*, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ১২১৭

৩। সুখময় ভট্টাচার্য, *রামায়ণের চরিতাবলী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৯৩